পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

# প্রমাণ ও মুজিজার বিশ্বকোষ

মুহাম্মদ ﷺ এর নবুওয়াত ও কুরআনের সত্যতার প্রমাণ

বৈজ্ঞানিক মুজিজা · ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য · সত্য হয়ে যাওয়া ভবিষ্যদ্বাণী

তাওরাত ও ইনজিলের সুসংবাদ · জিন, জাদু ও অদৃশ্যের জগৎ

**শিশুও বুঝতে পারে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা · 157টি রঙিন চিত্র**

**157টি প্রমাণ, শক্তি অনুসারে সাজানো**

ষষ্ঠ পর্ব

# ভাষার মুজিজা ও খোলা চ্যালেঞ্জ

সবচেয়ে বড় মুজিজা আকাশেও নেই, পৃথিবীতেও নেই — তা রয়েছে স্বয়ং এই কিতাবেই: এমন এক চ্যালেঞ্জ যা চৌদ্দশ বছর ধরে খোলা পড়ে আছে, আর যা গ্রহণ করার সাহস আজ পর্যন্ত কেউ করেনি।

**12 প্রমাণ**

চ্যালেঞ্জ

# 146 তিন ধাপে নেমে আসা এক চ্যালেঞ্জ — যা আজও কেউ নেয়নি

আর তোমরা যদি সন্দেহে থাক আমার বান্দার প্রতি আমি যা নাজিল করেছি তা নিয়ে, তবে এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে এস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীদের ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

সূরা আল-বাকারা — আয়াত 23

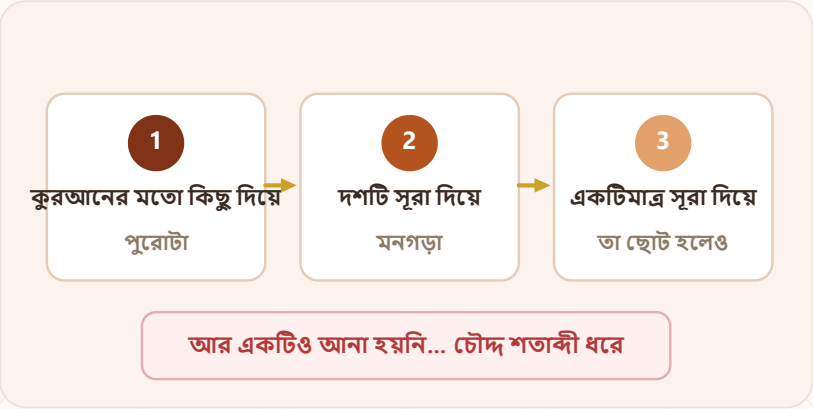


চ্যালেঞ্জ ধাপে ধাপে নামতে থাকে, যতক্ষণ না তা সম্ভাব্য সর্বনিম্নে পৌঁছায়

### সহজ কথায়

কুরআন আরবদের চ্যালেঞ্জ দিল এর অনুরূপ কিছু আনতে। তারা ব্যর্থ হলে সীমা নামিয়ে দেওয়া হল: দশটি সূরা। তাতেও ব্যর্থ হলে আরও নামানো হল: **মাত্র একটি সূরা**, তা তিনটি ছোট আয়াতের হলেও চলবে। আজ পর্যন্ত কেউ তা আনতে পারেনি।

### তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরবরা ছিল **অবিসংবাদিতভাবে বাগ্মিতার জাতি**। কবিতা ছিল তাদের দলিল ও গর্ব; উকাজ ও জুল-মাজাজে এর জন্য মেলা বসত, আর তাদের শ্রেষ্ঠ কাসিদাগুলোর মর্যাদা এত উঁচু ছিল যে সেগুলোর নামই হয়ে গেল মুআল্লাকাত। তাদের মধ্যে ছিলেন ইমরুল কায়েস, জুহাইর, লাবিদ ও তারাফা। আর এই দাওয়াতকে সহজতম পথে ভেঙে দেওয়ার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল তাদেরই।

### বিজ্ঞান আজ কী বলে?

চৌদ্দ শতাব্দী পেরিয়ে গেছে, মানুষ চেষ্টা করেছে, কিছুই টেকেনি। মুসাইলামা কাজ্জাব, ইবনুল মুকাফফা ও অন্যদের নামে যা চালানো হয়েছে তা পড়লে যে কেউ দেখবেন, সেগুলো **প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, উপহাসের বস্তু**। চ্যালেঞ্জ আজও দাঁড়িয়ে আছে, আর আজকের উপকরণ অনেক বড়: ভাষা-একাডেমি, বিশ্ববিদ্যালয়, ডিজিটাল অভিধান, শৈলী বিশ্লেষণকারী কম্পিউটার। তবু একটি লেখাও আসেনি যা দেখে ভাষার পণ্ডিতরা বলেছেন: এটি এর অনুরূপ।

### কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

দুটি জিনিস এই চ্যালেঞ্জকে অনন্য করে তোলে। প্রথমত, **ধাপে ধাপে নিচে নামা** — চ্যালেঞ্জকারী সাধারণত যা করে তার ঠিক উল্টো। যে বাড়িয়ে বলে সে সীমা উঁচু করে রাখে, যেন তা নাগালের বাইরে থাকে; আর এটি সীমা নামাতে নামাতে সম্ভাব্য সর্বনিম্নে নিয়ে এল: **একটিমাত্র সূরা, তা কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরা হলেও**। দ্বিতীয়ত, এটি **যে কারও সাহায্য নেওয়ার অনুমতি দিল**: "আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীদের ডাক" — অর্থাৎ সবাই মিলে এস, যাকে ইচ্ছা ডাক। তারপর আরেক আয়াতে আগেভাগেই ফলাফল ঘোষণা করে দিল: "**যদি না পার — আর কখনোই পারবে না**" — ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন নিশ্চিত ঘোষণা কোনো জুয়াড়ি করার সাহস পায় না।

147

উম্মি হওয়া

# এর আগে আপনি কোনো কিতাব পাঠ করেননি

আর এর আগে আপনি কোনো কিতাব পাঠ করতেন না, নিজ ডান হাতে তা লিখতেনও না; তা হলে মিথ্যাশ্রয়ীরা অবশ্যই সন্দেহ করত।

সূরা আল-আনকাবুত — আয়াত 48

**তিনি পড়তে-লিখতে জানলে অস্বীকারকারীর দলিল থাকত**

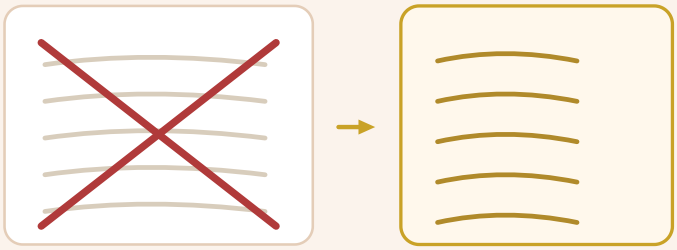

পড়েন না, লেখেন না

আরবির শ্রেষ্ঠ অলংকারময় কিতাব

এখানে নিরক্ষরতা কোনো ঘাটতি নয়... বরং তা-ই প্রমাণ

### সহজ কথায়

নবী ﷺ **পড়তেও জানতেন না, লিখতেও জানতেন না**, কারও কাছে পড়াশোনাও করেননি। আয়াতটি তা উল্লেখ করে এবং কারণও বলে দেয়: তিনি যদি পড়তে ও লিখতে জানতেন, **তবে মানুষ সন্দেহ করত** এবং বলত, কিতাব থেকে নকল করেছেন।

### তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মক্কায় লেখার চল ছিল দুর্লভ, নিরক্ষরতাই ছিল স্বাভাবিক। তবু মক্কায় এমন লোক ছিল যারা পড়ত ও লিখত, আর উপদ্বীপে ছিল ইহুদি ও খ্রিস্টান, যাদের কিতাব ও পণ্ডিত দুই-ই ছিল। কাজেই নবী ﷺ যদি পাঠক ও লেখক হতেন, অভিযোগটি হাতের কাছেই তৈরি থাকত এবং তার কোনো জবাব থাকত না।

### বিজ্ঞান আজ কী বলে?

নবী ﷺ-এর উম্মি হওয়া তাঁর জীবনীর সবচেয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্যগুলোর একটি; তাঁর সমকালীন বিরোধীরাও এ নিয়ে বিতর্ক করেনি — অথচ দোষ খোঁজায় তারাই ছিল সবচেয়ে আগ্রহী। তারা **এটি ছাড়া আর সব অভিযোগই করেছে**: কবি, জাদুকর, গণক, পাগল — আর বলেছে "এক মানুষই তো তাকে শেখায়"। কুরআন জবাব দিল: "তারা যার প্রতি ইঙ্গিত করছে তার ভাষা তো আরবি নয়, আর এ তো স্পষ্ট আরবি ভাষা।" অর্থাৎ যার দিকে তারা ইঙ্গিত করেছিল, সে আরবিই ভালো জানত না।

### কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

কুরআন এখানে **তার বিরুদ্ধে যে যুক্তিটি দেওয়া যেত তা নিজেই তুলে ধরে, তারপর তা ভেঙে দেয়**। এই পথ কেবল আত্মবিশ্বাসী বক্তাই নেন। আয়াতটি বলছে: বিস্ময় এই নয় যে কিতাবটি মহান, বরং বিস্ময় এই যে তা এসেছে **এমন একজনের মুখে যিনি পড়তেও জানেন না, লিখতেও জানেন না**। তারপর বিষয়টিকে আরও গুরুতর করে তোলে এই যে, এই গ্রন্থে রয়েছে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর সংবাদ ও সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক বিবরণ, উত্তরাধিকার, বিচার ও যুদ্ধ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বিধান, এবং তখনও অজানা মহাজাগতিক বিষয়ের বর্ণনা। এ সবই এমন একজনের কাছ থেকে, যিনি এক লাইনও পড়তে পারতেন না। আর এটাই "**তা হলে মিথ্যাশ্রয়ীরা অবশ্যই সন্দেহ করত**" কথাটির অর্থ — তাঁর উম্মি হওয়াই সন্দেহের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

স্ববিরোধহীনতা

# ১৪৮ তেইশ বছর — একটিও স্ববিরোধ ছাড়া

তারা কি কুরআন নিয়ে গভীরভাবে ভাবে না? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে আসত, তবে তারা এতে বহু অসঙ্গতি পেত।

সূরা আন-নিসা — আয়াত ৪২

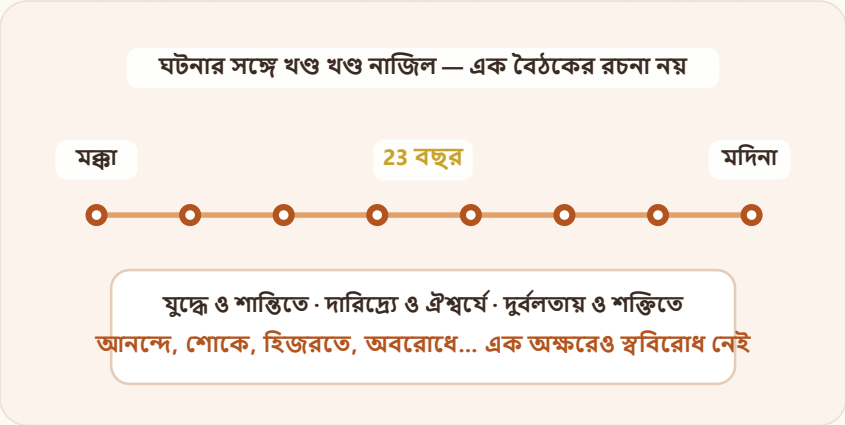


এমন এক কিতাব যা এক বৈঠকে লেখা হয়নি, পর্যালোচনাও হয়নি, সংশোধনও হয়নি

### সহজ কথায়

কুরআন নাজিল হয়েছে **তেইশ বছর ধরে খণ্ড খণ্ড আকারে** — ঘটনার প্রয়োজনে এক আয়াত, কয়েক আয়াত; যুদ্ধে ও শান্তিতে, কষ্টে ও স্বাচ্ছন্দ্যে। তবু এতে আপনি কোনো স্ববিরোধ পাবেন না, পদ্ধতির কোনো বদল পাবেন না, আগের কোনো কথা থেকে ফিরে আসাও পাবেন না।

### তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

বই এক বৈঠকে রচিত হয়, তারপর প্রকাশের আগে পর্যালোচনা ও সংশোধন হয়, ফলে তার অসঙ্গতিগুলো মুছে ফেলা যায়। কুরআন তার বিপরীত: **নাজিল হওয়ামাত্রই** তা মানুষের সামনে পড়া হত; তারা মুখস্থ করত, লিখে রাখত, তারপর যা গত হয়েছে তা বদলানোর আর কোনো পথ থাকত না। আর মক্কায় যা নাজিল হয়েছিল তার সবই হিজরতের বহু বছর আগেই বিরোধীদের হাতে পৌঁছে গিয়েছিল।

### বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আজ যে কেউ নিজেই এটি পরখ করে দেখতে পারেন: বিশ বছর ধরে খণ্ড খণ্ড করে একটি লেখা লিখুন, যাতে থাকবে আকিদা, বিধান, ইতিহাস, নৈতিকতা, মহাবিশ্ব ও আত্মা; তারপর শেষে তা পর্যালোচনা করে দেখুন তাতে কোনো স্ববিরোধ পাওয়া যায় কি না। গবেষকরা — মুসলিম ও অমুসলিম — চৌদ্দ শতাব্দী ধরে কুরআনে স্ববিরোধ খুঁজেছেন; "মুশকিলুল কুরআন" ও "তাবিলু মুখতালিফিল আয়াত" নিয়ে আস্ত আস্ত কিতাব লেখা হয়েছে, আর সবই শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, যা ভিন্ন বলে মনে হয় তা **বৈচিত্র্যের ভিন্নতা, বিরোধের নয়**।

### কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

আয়াতটি এখানে কোনো দাবি নয়, **একটি বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগযোগ্য মানদণ্ড** পেশ করছে। বলছে: এটি মানুষের রচনা হলে **তোমরা এতে বহু অসঙ্গতি পেতে**। যুক্তির দিক থেকেও কথাটি ঠিক: বদলে যেতে থাকা পরিস্থিতিতে বিশ বছর ধরে বিস্তৃত কোনো লেখা তার রচয়িতার বদলে যাওয়া অবস্থার ছাপ বহন করবেই। আরও বিস্ময়কর হল, পরিস্থিতি বদলালেও সুর বদলায়নি: ক্ষমা ও দয়ার আয়াত নাজিল হয়েছে **বিজয়ের পরে**, আগে নয়; আর অবিচলতা ও প্রতিশ্রুতির আয়াত নাজিল হয়েছে **পরাজয় ও অবরোধের সময়**। লেখাটি যদি তার রচয়িতার অবস্থার প্রতিফলন হত, তবে উল্টোটাই প্রত্যাশিত ছিল।

বিরোধীর সাক্ষ্য

# 149 ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরার সাক্ষ্য

আল্লাহর কসম, এর মধ্যে রয়েছে মাধুর্য, এর উপরে রয়েছে সৌন্দর্য; এর নিচের অংশ সুজলা, উপরের অংশ ফলবতী; আর এ কথা কোনো মানুষের কথা নয়।

হাকিম ও বায়হাকি দালাইলে বর্ণনা করেছেন — সিরাতের কিতাবে প্রসিদ্ধ

বলেছিল কুরাইশের সবচেয়ে বিচক্ষণ ও কট্টর শত্রু

"এতে আছে মাধুর্য... আর এর উপরে আছে লাবণ্য"

"এর নিচ পানিতে ভরা, আর এর উপর ফলবান"

"এ কথা কোনো মানুষের কথা নয়"

তারপর ফিরে বলল: "এ তো চলে আসা এক জাদু বৈ কিছু নয়"

তিনি সত্যটি স্বীকার করলেন... তারপর বেছে নিলেন এমন রায় যা নিজ গোত্রকে খুশি করে

### সহজ কথায়

ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরা ছিলেন কুরাইশের সবচেয়ে বিচক্ষণ ও বাক্য-বিশারদদের একজন, আর ছিলেন এই দাওয়াতের কঠিনতম শত্রুদের একজন। কুরআন শুনে তিনি তার সবচেয়ে সুন্দর বর্ণনা দিলেন এবং বললেন: **"এ কথা কোনো মানুষের কথা নয়।"** এরপর তাঁর গোত্র চাপ দিল, আর তিনি বললেন: "এ তো চিরাচরিত জাদু ছাড়া কিছু নয়।"

### তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মৌসুমের আগে হাজিদের কাছে মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে কী বলা হবে, কুরাইশ তার একটি শব্দ খুঁজছিল। তাই তারা ওয়ালিদের কাছে জড়ো হল, কারণ তিনিই ছিলেন তাদের সবচেয়ে বিবেচক এবং কবিতা ও বাগ্মিতায় সবচেয়ে জ্ঞানী। তারা তাঁর সামনে রাখল: গণক? পাগল? কবি? জাদুকর? — আর তিনি বাক্যশিল্পের ভেতর থেকেই যুক্তি এনে **প্রতিটিই খারিজ করে দিলেন**।

### বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ঘটনাটি সিরাত ও তাফসিরের কিতাবে প্রসিদ্ধ, আর তাঁর সম্পর্কে যা নাজিল হয়েছে তা সূরা আল-মুদ্দাসসিরে: "**সে চিন্তা করল ও পরিমাপ করল। ধ্বংস হোক সে, কীভাবে সে পরিমাপ করল। আবার ধ্বংস হোক সে, কীভাবে সে পরিমাপ করল। তারপর সে তাকাল। তারপর ভ্রু কুঁচকাল ও মুখ বিকৃত করল। তারপর পিঠ ফিরাল ও অহংকার করল, আর বলল: এ তো চিরাচরিত জাদু ছাড়া কিছু নয়।**" আয়াতগুলো তার মনের অবস্থা নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে: চিন্তা, তারপর পরিমাপ, তারপর দৃষ্টি, তারপর ভ্রুকুটি, তারপর অহংকারভরে মুখ ফিরানো, তারপর সেই রায় যা দিয়ে সে নিজ গোত্রকে খুশি করল। আর গণকতা ও কবিতা খারিজ করার ক্ষেত্রে তার যুক্তিগুলো বিস্তারিতভাবেই বর্ণিত আছে।

### কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

বিরোধীর সাক্ষ্য সবচেয়ে শক্তিশালী সাক্ষ্য, বিশেষত যখন সে **যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে সেই বিষয়েরই বিশেষজ্ঞ**। ওয়ালিদ ছিলেন কবিতার বিচারক, যাঁর সামনে কাসিদা পেশ করা হত। তিনি কুরআন আর বাইরে থেকে তার মতো দেখায় এমন সব কিছুর মধ্যে সূক্ষ্ম শিল্প-বিভাজন টেনেছেন: কবিতা সম্পর্কে বলেছেন, "আমি তো সমস্ত কবিতা জানি... এ কবিতা নয়"; আর গণকতা সম্পর্কে, "এ গণকের গুনগুনানিও নয়, তার ছন্দও নয়"। তারপর এর গড়নের বর্ণনা দিয়েছেন: "**এর নিচের অংশ সুজলা, উপরের অংশ ফলবতী**" — অর্থাৎ বাইরেটা সুন্দর, ভেতরটা অর্থে ভরপুর। এটি কোনো ভক্তের প্রশংসা নয়, এক শত্রু-বিশেষজ্ঞের কারিগরি বর্ণনা। আর **নিজ গোত্রের চাপে** তাঁর কথা থেকে ফিরে আসা — যা কুরআনেই লিপিবদ্ধ — প্রকাশ করে দেয় যে অস্বীকারটি ছিল একটি সামাজিক অবস্থান, বুদ্ধিগত প্রত্যয় নয়।

সূত্র «ابن هشام – «السِّيرةُ النَّبويّة» · البيهقي – «دَلائلُ النُّبوّة»

150

স্বতন্ত্র শ্রেণি

# কবিতা নয়, গদ্য নয়, গণকের ছন্দও নয়

আর এ কোনো কবির কথা নয় — তোমরা খুব কমই ঈমান আন। কোনো গণকের কথাও নয় — তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।

**সূরা আল-হাক্কাহ — আয়াত 41-42**

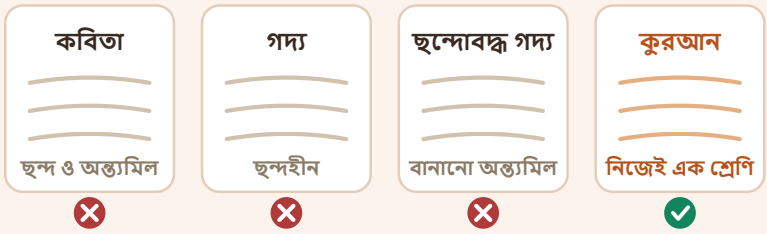


**ভাষার লোকেরা নিজেরাই একে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেনি**

**এমন এক লেখা যা আরবির পরিচিত কোনো ছাঁচেই আঁটে না**

### সহজ কথায়

আরবিতে উঁচু মানের কথার তিনটি রূপ ছিল: ছন্দসহ **কবিতা**, মুক্ত **গদ্য**, আর **গণকদের ছন্দোবদ্ধ বাক্য**। কুরআন এর কোনোটিই নয় — বরং নিজেই একটি স্বতন্ত্র শ্রেণি।

### তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

কবিতার ছন্দ, বহর ও অন্ত্যমিলে আরবরা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বিশেষজ্ঞ জাতি; সহজাত বোধেই তারা ভাঙা চরণ ধরে ফেলত। গণকদের ছন্দোবদ্ধ বাক্যও তারা চিনত এবং তার কৃত্রিমতা নিয়ে উপহাস করত। তবু **কুরআন সম্পর্কে তাদের রায় ভীষণভাবে টলমল করেছে**: বলল কবিতা, তারপর জাদু, তারপর গণকতা, তারপর পূর্বপুরুষদের উপকথা — প্রতিটি মতই আগেরটিকে বাতিল করে দিয়েছে।

### বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কুরআন কবিতা থেকে আলাদা, কারণ তা **কোনো ছন্দ বা নির্দিষ্ট অন্ত্যমিল মেনে চলে না**; গদ্য থেকে আলাদা, কারণ তাতে রয়েছে **ভেতরের একটি তাল ও নিয়মিত ফাসিলা**; আর ছন্দোবদ্ধ বাক্য থেকে আলাদা, কারণ গণকের ছন্দে **ছন্দ রক্ষার জন্য শব্দকে জোর করে বসানো হয়**, অথচ কুরআনে ফাসিলা অর্থকে অনুসরণ করে, অর্থের ওপর শাসন করে না। ফাসিলা আর গণকের ছন্দের এই পার্থক্য আরবি অলংকারশাস্ত্রের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আলোচনা। প্রাচ্যবিদ আরবেরি বলেছেন, কুরআনের বাগ্মিতা ও তাল এতটাই শক্তিশালী ও হৃদয়স্পর্শী যে প্রতিটি অনুবাদই মূলের দীপ্তির এক ম্লান অনুলিপি হয়ে থাকে।

### কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

শ্রেণিবিন্যাসে বিরোধীদের এই টলমল অবস্থাই প্রমাণ। কোনো শিল্পের বিশেষজ্ঞরা যখন একটি লেখাকে নিজেদের শিল্পের কোনো শাখাতেই ফেলতে পারেন না, আর এক বৈঠক থেকে আরেক বৈঠকে তাঁদের রায় নিজেই নিজের সঙ্গে বিরোধ বাধায়, তখন সেটিই ইঙ্গিত যে লেখাটি তাঁদের জানা শ্রেণির বাইরে। আর কুরআন তাদের এই টলমল অবস্থাটিই তাদের বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ করেছে: "**দেখুন, তারা আপনার জন্য কেমন উপমা দিচ্ছে, ফলে তারা পথ হারিয়েছে।**" এরপর তাদেরই আয়ত্ত করা মানদণ্ডে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে: তরবারি দিয়ে নয়, ধন দিয়ে নয়, বরং **যে শিল্পে তারা পৃথিবীর সব জাতিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল সেই শিল্প দিয়েই**। আর যে কিতাব বানিয়ে আনে, সে বিরোধীদের ঠিক সেই ময়দানেই চ্যালেঞ্জ দেওয়ার জুয়া খেলে না যে ময়দানে তারা শ্রেষ্ঠ।

সূত্র Arberry – *The Koran Interpreted*

# ১৫১ যে কিতাব তার বাহককেই তিরস্কার করে

তিনি ভ্রু কুঁচকালেন ও মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কারণ তাঁর কাছে অন্ধ লোকটি এসেছিল। আর আপনি কী জানেন, হয়তো সে পরিশুদ্ধ হত?

**সূরা আবাসা — আয়াত 1-3**

**এমন আয়াত, যাতে নবি ﷺ-কে স্পষ্ট তিরস্কার**

**“ভ্রুকুটি করে মুখ ফেরালেন” · “আল্লাহ ক্ষমা করুন, কেন অনুমতি দিলেন”**

**“কোনো নবির জন্য বন্দি রাখা সংগত নয়” · “আর আপনি মনে গোপন রাখছিলেন”**

**তারপর নামাজে মানুষের সামনে উচ্চস্বরে পড়া হয়**

**আর মুখস্থ হয়, লেখা হয়, কখনো মোছা হয় না**

**যে কিতাব বানিয়ে আনে, সে তাতে নিজের নিন্দা রাখে না**

### সহজ কথায়

কুরআনে এমন আয়াত আছে যা **স্বয়ং নবী ﷺ-কে তিরস্কার করে** এবং তাঁর একটি অবস্থান সংশোধন করে দেয়। এই আয়াতগুলো নামাজে মানুষের সামনে উচ্চস্বরে পড়া হয়, ছোট-বড় সবাই মুখস্থ করে, আর কখনো সেগুলো মুছে ফেলাও হয়নি, হালকাও করা হয়নি।

### তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

যে নবুওয়াতের দাবি করে তার দরকার **ত্রুটিহীন একটি পূর্ণ ভাবমূর্তি**, আর তার শত্রুরা যেকোনো স্খলনের জন্য ওত পেতে থাকে। কাজেই এমন এক বাণী নাজিল হওয়া যা তাঁকে তিরস্কার করে ও তাঁর সিদ্ধান্তকে ভুল বলে, তারপর তা মসজিদে সবার সামনে পাঠ করা — এ প্রতিটি রাজনৈতিক ও মানসিক হিসাবের বিরুদ্ধে যায়।

### বিজ্ঞান আজ কী বলে?

উদাহরণ অনেক এবং স্পষ্ট: **গোটা সূরা আবাসা** তাঁর তিরস্কারে, যখন তিনি এক অন্ধ লোকের কাছ থেকে কুরাইশ-নেতাদের দিকে ফিরেছিলেন; তাবুক থেকে পিছিয়ে থাকাদের অনুমতি দেওয়ার প্রসঙ্গে “**আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদের অনুমতি দিলেন?**”; বদরের বন্দিদের প্রসঙ্গে “**কোনো নবীর জন্য শোভনীয় নয় যে তার কাছে বন্দি থাকবে, যতক্ষণ না সে জমিনে যুদ্ধে প্রবল হয়**”; “**আর আপনি নিজের মনে তা গোপন করছিলেন যা আল্লাহ প্রকাশ করতে যাচ্ছেন, আর আপনি মানুষকে ভয় করছিলেন, অথচ আল্লাহই অধিক হকদার যে আপনি তাঁকে ভয় করবেন**”; আর “**আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন তা আপনি কেন হারাম করছেন?**” আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন: নবী ﷺ যদি ওহির কিছু গোপন করতেন, তবে এই আয়াতটিই গোপন করতেন।

### কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এটি এই অধ্যায়ের সবচেয়ে শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিগুলোর একটি, যাকে ঐতিহাসিকরা বলেন **“বিব্রতকরতার মানদণ্ড”**: যে বাণী তার বাহকের স্বার্থের ক্ষতি করে, তা সত্যের বেশি কাছাকাছি। আর লক্ষ করুন, তিরস্কার কোনো গৌণ বিষয়ে আসেনি, এসেছে **বড় বড় রাজনৈতিক ও সামরিক সিদ্ধান্তে**: বন্দিদের সঙ্গে আচরণ, মুনাফিকদের অনুমতি দেওয়া, এবং তাঁর নিজ ঘরের একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। এর সঙ্গে আরেকটি বিষয় যোগ করুন: কুরআন **কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে, কিছুর দেয়নি**; বরং ইফকের ঘটনায় নবী ﷺ-এর কাছে ওহি পুরো এক মাস আসেনি, অথচ তখন তাঁর স্ত্রীই অভিযুক্ত, আর মানুষ যা বলার বলে যাচ্ছে। বিষয়টি যদি তাঁর নিজের হাতে থাকত, তবে তা একদিনও দেরি হত না।

শৈলীর পার্থক্য

# ১৫২ তাঁর নিজের কথা ﷺ কখনোই কুরআনের মতো নয়

আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তা তো কেবল ওহি, যা পাঠানো হয়।

সূরা আন-নাজম — আয়াত ৩-৪

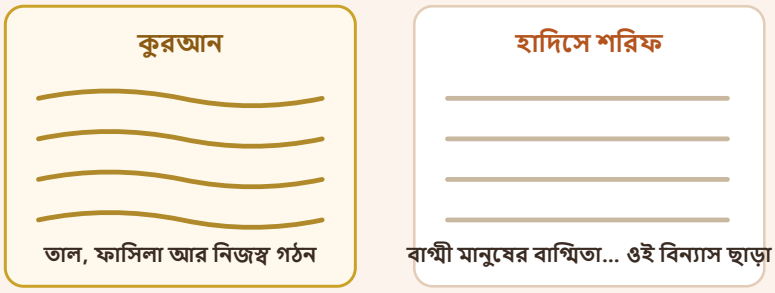


### সহজ কথায়

নবী ﷺ ছিলেন আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বাকপটু, আর তাঁর হাদিসগুলো বাগ্মিতার চূড়ায়। তবু **তাঁর কথা কারও কাছে কখনো কুরআনের সঙ্গে গুলিয়ে যায়নি** — দুটি শৈলী স্পষ্টভাবেই আলাদা, আর একটিবারও কোনো হাদিসকে ভুল করে কুরআন বলে চালানো হয়নি।

### তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

কুরআন যদি তাঁরই ﷺ রচনা হত, তবে তাঁর সমস্ত কথায় একটিই শৈলী থাকত — কারণ মানুষ এমন এক শৈলীগত ছাপ বহন করে যা থেকে সে মুক্ত হতে পারে না, বিশেষত বিশ বছরের ব্যাপ্তিতে। আর তাঁর সাহাবিরা প্রতিদিনই দুটোই শুনতেন, অথচ একটি মুহূর্তের জন্যও দুটি তাঁদের কাছে মিলেমিশে যায়নি।

### বিজ্ঞান আজ কী বলে?

**শৈলী-পরিমাপ** (Stylometry) আজ একটি প্রতিষ্ঠিত বিদ্যা, যা শব্দের বিন্যাস, বাক্যের দৈর্ঘ্য ও গঠনের ধরন মেপে লেখাকে তার রচয়িতার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। কুরআন ও হাদিসের ওপর তা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং দুটির পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গঠনের সবচেয়ে স্পষ্ট পার্থক্য: কুরআন দাঁড়িয়ে আছে **নিয়মিত ফাসিলার** ওপর, সম্বোধনের পালাবদল ও সর্বনামের চলাচলের ওপর; হাদিস এই গড়নে চলে না। তারপর কুরআন **স্বয়ং নবী ﷺ-কেই আদেশ, নিষেধ ও তিরস্কারের ভঙ্গিতে সম্বোধন করে** এবং তাঁকে "বলুন" বলতে নির্দেশ দেয় — তিনশোরও বেশি বার।

### কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এর সঙ্গে তৃতীয় একটি শ্রেণি যোগ করুন: **হাদিসে কুদসি** — যা নবী ﷺ তাঁর রবের কাছ থেকে অর্থের দিক দিয়ে বর্ণনা করেন, তবু তা **কুরআন গণ্য হয় না এবং নামাজে পড়া হয় না**। অর্থাৎ একজন মানুষের মুখে উচ্চারিত তিনটি স্তরের কথা আমাদের সামনে আছে, আর বিধান ও আচরণে সেগুলোর মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্য করা হয়: কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ইবাদত হয়, চ্যালেঞ্জ তাকে নিয়েই, আর তা বর্ণিত হয়েছে অক্ষরে অক্ষরে মুতাওয়াতির সূত্রে; হাদিসে কুদসির অর্থ আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত, আর বর্ণনা হয় নবী ﷺ-এর নিজ ভাষায়; আর নববি হাদিস তাঁরই কথা। এই **সূক্ষ্ম ত্রিমুখী পার্থক্য** প্রথম দিন থেকেই দাঁড়িয়ে আছে এবং কখনো ঝাপসা হয়নি। সবটাই যদি একই মানবিক উৎস থেকে আসত, তবে বিশ বছর ধরে এই বিভাজন ধরে রাখা সম্ভব হত না।

সূত্র Burrows (2002) – *"Delta": a Measure of Stylistic Difference* · Stylometry

153

সংক্ষিপ্ততা

# আর কিসাসের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন

আর হে বুদ্ধিমানগণ, কিসাসের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।

সূরা আল-বাকারা — আয়াত 179

আরবের বলা শ্রেষ্ঠতম কথা
"হত্যাই হত্যা বেশি ঠেকায়"
14 অক্ষর

→

আর কুরআন বলল
"কিসাসে তোমাদের জীবন"
অক্ষরে কম... অর্থে অনেক বেশি

তাতে জীবন আছে, শুধু হত্যার নিষেধ নয় · লক্ষ্য বলা হয়েছে, উপায় নয়
আর তা বাঁধল ন্যায্য কিসাসে, খোলা হত্যায় নয়

অলংকারশাস্ত্রের পণ্ডিতদের পড়া শত শত উদাহরণের একটি

### সহজ কথায়

এই অর্থে আরবরা যে কথাটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি গর্ব করত তা হল: **"হত্যাই হত্যাকে সবচেয়ে বেশি ঠেকায়।"** তারপর কুরআন এল **কম অক্ষরে অনেক বেশি অর্থ** ভরা একটি বাক্য নিয়ে: "আর কিসাসের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন।"

### তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

"হত্যাই হত্যাকে সবচেয়ে বেশি ঠেকায়" আরবদের কাছে সংক্ষিপ্ততার শিখর বলে গণ্য হত এবং প্রবাদ হিসেবে উদ্ধৃত হত। বড় বড় অর্থকে অল্প কথায় গুছিয়ে আনতে তারা প্রতিযোগিতা করত এবং সেটিকেই ভাষার শ্রেষ্ঠ স্তর মনে করত।

### বিজ্ঞান আজ কী বলে?

অলংকারশাস্ত্রের পণ্ডিতরা দুটির পার্থক্য বিশ্লেষণ করে সাতটিরও বেশি দিক পেয়েছেন। সবচেয়ে স্পষ্টগুলোর মধ্যে: কুরআন উল্লেখ করেছে **জীবন**, যা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, আর প্রবাদটি উল্লেখ করেছে হত্যা, যা অপছন্দনীয়; কুরআন তাকে **"কিসাস"** দিয়ে নির্দিষ্ট করেছে, অর্থাৎ ন্যায়সংগত ও বৈধ হত্যা, আর প্রবাদটি হত্যাকে অনির্দিষ্ট রেখেছে, ফলে তাতে অন্যায়ও ঢুকে পড়েছে; কুরআন প্রমাণ করেছে **গোটা সমাজের জন্য চলমান এক জীবন**, কেবল একটি ঘটনার নিষেধ নয়; কুরআন "হত্যা" শব্দটি দুবার বলা এড়িয়ে গেছে; আর শেষ করেছে নৈতিক লক্ষ্যে: "যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর"। এ সবই কম অক্ষরে।

### কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এখানে গুরুত্বপূর্ণ কেবল এই একটি উদাহরণ নয়, বরং **এটি যে কোনো ব্যতিক্রম নয়** সেটিই। আরবি অলংকারশাস্ত্রের গোটা বিদ্যা — মাআনি, বায়ান ও বাদি — মূলত এই লেখাটির অনতিক্রম্যতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা থেকেই জন্ম নিয়েছে, আর তাতে শত শত কিতাব রচিত হয়েছে: বাকিল্লানির "ইজাজুল কুরআন" থেকে আবদুল কাহির জুরজানির "দালাইলুল ইজাজ" ও "আসরারুল বালাগা" পর্যন্ত। অর্থাৎ **একটিমাত্র কিতাব বিশ্লেষণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মানবিক বিদ্যা দাঁড়িয়ে গেছে** — পৃথিবীর কোনো ভাষার ইতিহাসে এর দ্বিতীয় নজির নেই। আর গবেষকরা আজও তা থেকে এমন কিছু বের করে আনছেন যা তাঁদের পূর্বসূরিরা বের করতে পারেননি।

সূত্র «الباقلّاني – «إعجازُ القرآن» · عبد القاهر الجرجاني – «دَلائلُ الإعجاز»

# 154 আমাকে দেওয়া হয়েছে জাওয়ামিউল কালিম

আমাকে জাওয়ামিউল কালিম দিয়ে পাঠানো হয়েছে।

**বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন — মুত্তাফাক আলাইহি**

- **"দ্বীন হলো কল্যাণকামিতা"**
- **"ক্ষতি নয়, ক্ষতির বদলাও নয়"**
- **"কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল"**
- **"মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমরা নিরাপদ"**

**গোনা কয়েকটি শব্দ... তার ওপর ফিকহের আস্ত অধ্যায়**

**সার্বিক কিছু নীতি, যা হাজার হাজার মাসআলাকে সাজিয়ে দেয়**

### সহজ কথায়

নবী ﷺ-এর বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি ছিল, তিনি বলতেন **অল্প কথা, যা বহু অর্থ বহন করে** — এটিই জাওয়ামিউল কালিম। কয়েকটি শব্দের হাদিসের ওপর ফিকহ ও আইনের আস্ত আস্ত অধ্যায় গড়ে উঠেছে।

### তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সংক্ষিপ্ত প্রজ্ঞাবাণী সব জাতির মধ্যেই পরিচিত: আরবদের প্রবাদ, ভারতের নীতিবচন, গ্রিকদের উপদেশ। কিন্তু সেগুলো **সাধারণ নৈতিক উপদেশ**, এমন নীতি নয় যার ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ আইনব্যবস্থা দাঁড় করানো যায়। আর প্রজ্ঞাবাণী ও ফিকহি নীতির মধ্যে পার্থক্যটি মৌলিক।

### বিজ্ঞান আজ কী বলে?

একটি উদাহরণ নিন: "**ক্ষতি করা যাবে না, ক্ষতির বদলে ক্ষতিও নয়**" — আরবিতে চারটি শব্দ। এর ওপর ইসলামি ফিকহের একটি পূর্ণ অধ্যায় গড়ে উঠেছে, যার আওতায় এসেছে প্রতিবেশীর অধিকার, নির্মাণ, তালাক, বেচাকেনা, শুফআ, জবরদখল, মালিকানা এবং মালিকের অধিকারের সীমা। এটি সেই **পাঁচটি বড় নীতির** একটিতে পরিণত হয়েছে যেগুলোর ওপর সব ফিকহি মাজহাব ঘোরে। এমনই আরেকটি হল "কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল", যাকে ইমামগণ জ্ঞানের এক-তৃতীয়াংশ গণ্য করেছেন, আর ইমাম শাফিয়ি বলেছেন এটি ফিকহের সত্তরটি অধ্যায়ে প্রবেশ করে।

### কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

**এমন একটি সার্বিক নীতি গড়ে তোলা, যা একই সঙ্গে সবটুকু ধারণ করে ও বাইরের সবকিছু বাদ দেয়** — দীর্ঘ কোনো লেখা লেখার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। নীতিটিকে তার আওতায় পড়া সবকিছু ধারণ করতে হবে, আওতার বাইরের সবকিছু বাদ দিতে হবে, আর রচয়িতার মাথায় কখনো আসেনি এমন পরিস্থিতির সামনেও টিকে থাকতে হবে। আইনপ্রণেতারা আজ এই কাজটিই করেন, ফলে তাঁদের আইন খণ্ডে খণ্ডে বের হয় আর প্রতি বছর সংশোধিত হয়। অথচ চার শব্দের একটি বাক্য চৌদ্দ শতাব্দী টিকে থাকবে এবং এমন সব ঘটনাও ধারণ করবে যেগুলোর অস্তিত্বই তখন ছিল না — শিল্প-দূষণ, ডিজিটাল ক্ষতি — এ এমন এক বিষয় যার সামনে থামা উচিত। আর লক্ষ করুন, হাদিসটি নিজেই এটিকে অর্জনের নয়, দানের দিকে সম্পৃক্ত করছে: "**আমাকে পাঠানো হয়েছে** জাওয়ামিউল কালিম দিয়ে।"

**সূত্র** «ابن رجب – «جامِعُ العُلوم والحِكَم» · السيوطي – «الأشباهُ والنَّظائر»

হিফজ

# ১৫৫ লক্ষ লক্ষ বুকে ধরে রাখা এক কিতাব

> বরং তা সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের বুকের ভেতরে।
>
> **সূরা আল-আনকাবুত — আয়াত 49**

**মানব ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি মুখস্থ করা কিতাব**

**প্রতি মহাদেশে প্রতি প্রজন্মে লক্ষ লক্ষ হাফেজ**

**প্রতিটি বুকে একটি জীবন্ত অনুলিপি — পোড়ানোও যায় না, বদলানোও যায় না**

### সহজ কথায়

কুরআন কেবল কিতাবে সংরক্ষিত হয়নি — হয়েছে **মানুষের বুকে**। চৌদ্দ শতাব্দী ধরে প্রতিটি প্রজন্মে লক্ষ লক্ষ মানুষ তা মুখস্থ করে আসছে, যাদের মধ্যে আছে এমন শিশুরাও যারা আরবি ভাষাই বলে না।

### তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

প্রাচীন কিতাবগুলো হাতেগোনা কয়েকটি অনুলিপিতে পুরোহিত ও পণ্ডিতদের কাছে রক্ষিত থাকত। গ্রন্থাগার পুড়ে গেলে বা অনুলিপি হারিয়ে গেলে কিতাবটিই হারিয়ে যেত — বহু কিতাবের বেলায় তা-ই ঘটেছে, যেগুলোর কেবল নামটুকুই আজ জানা যায়। আর নিরক্ষরতা ছিল যেকোনো লেখার বিস্তারের পথে বাধা।

### বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আজ কুরআনের হাফেজের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ বলে ধরা হয় — ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, তুরস্ক, পাকিস্তান, আরব দেশগুলো, ইউরোপ ও আমেরিকায়। তাঁদের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হয়, যেখানে তাঁরা হরকত ও তাজবিদসহ অক্ষরে অক্ষরে তিলাওয়াতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আর **তাঁদের অধিকাংশই অনারব** — অর্থাৎ তাঁরা এমন এক ভাষার লেখা মুখস্থ করেন যা তাঁদের মাতৃভাষা নয়। মানব-ইতিহাসে আর কোনো কিতাব এত বিপুল সংখ্যায় ও এমন নিখুঁতভাবে মুখস্থ হয়েছে বলে জানা যায় না।

### কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

**বিকৃতির অসম্ভবতার** ওপর এর প্রভাবই হল তাৎপর্যের জায়গা। কেবল কিতাবে সংরক্ষিত কোনো লেখা অনুলিপিগুলোর ওপর কর্তৃত্ব নিয়ে বদলে ফেলা যায়। কিন্তু যে লেখা দূর দূর মহাদেশে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখস্থ, যাদের এক করে রাখে না কোনো কর্তৃপক্ষ, না কোনো ভাষা, না কোনো রাষ্ট্র, আর যা প্রতিদিন পাঁচ বার নামাজে পড়া হয় — তার একটি অক্ষর বদলানো **বাস্তবে অসম্ভব**, কারণ প্রথম জামাতের নামাজেই তা ধরা পড়ে যাবে। আয়াতটি ঠিক এদিকেই সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করছে: "সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ **বুকের ভেতরে**" — "পাতায়" নয়। আর এটিই "আমিই কুরআন নাজিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক" কথাটির বাস্তব রূপায়ণ, এমন এক মানবিক প্রক্রিয়ায় যা পর্যবেক্ষণ ও গণনা করা যায়।

156

আয়াতের সমাপ্তি

# প্রতিটি আয়াত শেষ হয় তার উপযুক্ত কথা দিয়ে

আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ۝ আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ۝ আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ

**কুরআনের নানা স্থানে ছড়িয়ে থাকা সমাপ্তি-বাক্য**

**সমাপ্তি-বাক্য বদলে দিলে অর্থ ভেঙে যায়**

| প্রসঙ্গ | সমাপ্তি | |
|---|---|---|
| শাস্তি ও ক্ষমতার প্রসঙ্গ | **"পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"** | ✓ |
| তাওবা ও ক্ষমার প্রসঙ্গ | **"ক্ষমাশীল, দয়ালু"** | ✓ |
| দোয়া ও অভিযোগের প্রসঙ্গ | **"সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"** | ✓ |

**ছয় হাজারের বেশি আয়াত… প্রতিটি সমাপ্তি নিজ জায়গায়**

**আয়াতের বিষয়বস্তু আর যে নামে তা শেষ হয়, এ দুইয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম সঙ্গতি**

### সহজ কথায়

কুরআনের অধিকাংশ আয়াত শেষ হয় আল্লাহর আসমাউল হুসনার দুটি নাম দিয়ে। আর আশ্চর্যের বিষয় হলো, **প্রতিটি সমাপ্তি তার আয়াতের বিষয়ের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মানায়** — একটি সমাপ্তি বদলে অন্যটি বসিয়ে দিলে আপনি সঙ্গে সঙ্গেই টের পাবেন, কিছু একটা বেঠিক হয়ে গেছে।

### তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আরবি কবিতা একটি কাসিদায় একই অন্ত্যমিল ধরে রাখে, আর প্রায়ই **সেই অন্ত্যমিলের খাতিরে শব্দকে টেনে আনা হয়**, এমনকি অপ্রয়োজনীয় শব্দ দিয়ে চরণ ভরাট করা হয়। সমালোচকেরা একে দোষ বলেই জানেন। আর গণকদের ছন্দোবদ্ধ গদ্য ছিল আরও বেশি কৃত্রিম। কাজেই ছন্দময় সমাপ্তিওয়ালা যেকোনো লেখায় এমন কৃত্রিমতা আশা করাই স্বাভাবিক।

### বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কুরআনে ঠিক এর উল্টোটা: **সমাপ্তি-বাক্য অর্থের অনুগামী, অর্থের শাসক নয়**। শাস্তি ও প্রতিশোধের আয়াত শেষ হয় "পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী" দিয়ে; তাওবার আয়াত "ক্ষমাশীল, দয়ালু" দিয়ে; আর দোয়ার আয়াত "সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ" দিয়ে — কারণ যে দোয়া করে, তার প্রয়োজন হলো তার কথা শোনা হোক আর তার অবস্থা জানা হোক। এই সূক্ষ্মতার সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ: চুরির আয়াত শেষ হয় "**পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়**" দিয়ে — শাস্তি কার্যকর করায় পরাক্রম আর তা বিধিবদ্ধ করায় প্রজ্ঞা; আর এর পরেই তাওবার আয়াত এলে তা শেষ হয় "**ক্ষমাশীল, দয়ালু**" দিয়ে। এ বিষয়ে "ইলমুল ফাওয়াসিল" নামে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থই রচিত হয়েছে।

### কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

নিজেই একবার পরখ করে দেখুন: যেকোনো ভাষার যেকোনো দীর্ঘ ছন্দোবদ্ধ লেখা নিন, আর যাচাই করুন প্রতিটি অন্ত্যমিল তার বাক্যের বিষয়ের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মানায় কি না। আপনি নিশ্চিতভাবেই এমন জায়গা পাবেন যা ছন্দ বা মিলের খাতিরে ভরাট করা — মানুষের কাজে এটাই স্বাভাবিক। অথচ কুরআনে ছয় হাজারেরও বেশি আয়াত, যার অধিকাংশই এমন সমাপ্তি-বাক্যে শেষ, আর তা নেমেছে **তেইশ বছর ধরে খণ্ড খণ্ড হয়ে** — কোনো খসড়া নেই, কোনো সংশোধন নেই। এত বিপুল সংখ্যায়, আর অবতরণের এই ধরনে, এই সঙ্গতি অটুট থাকা ভাষাগত দক্ষতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না — সে দক্ষতা যত বড়ই হোক।

সূত্র «الزركشي – «البُرهانُ في عُلومِ القرآن» · فخر الدين الرازي – «مَفاتيحُ الغَيب

# 157 আর এখন — এই সবকিছু নিয়ে আপনি কী করবেন?

আমি অচিরেই তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাব দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, যতক্ষণ না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই সত্য। এটা কি যথেষ্ট নয় যে আপনার রব সব কিছুর সাক্ষী?

সূরা ফুসসিলাত — আয়াত 53

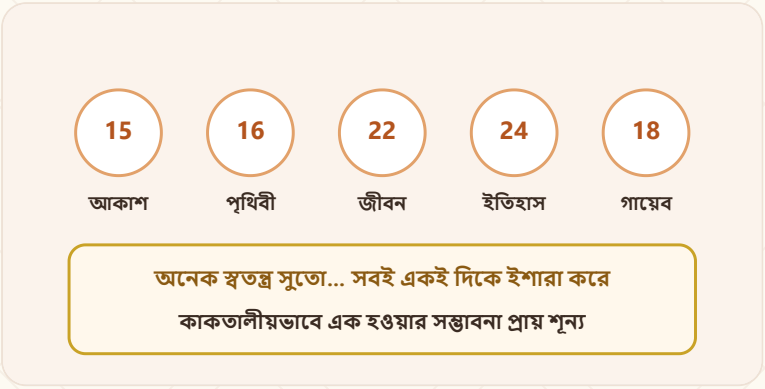


আপনাকে একটিমাত্র প্রমাণ মেনে নিতে বলা হচ্ছে না... বলা হচ্ছে সবগুলো একসঙ্গে দেখতে

### সহজ কথায়

আপনি বইয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছেন। যে প্রমাণগুলো আপনার সামনে দিয়ে গেল, তার প্রতিটি নিয়ে আলাদাভাবে তর্ক করা যায়। কিন্তু আসল প্রশ্নটি হলো: **এগুলো সব একজন মানুষের মধ্যে কাকতালীয়ভাবে একত্র হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু?**

### তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ইতিহাসের প্রতিটি জাতির কাছেই এমন কিছু ছিল, যাকে সে মহান বলে মানত। কিন্তু যে প্রশ্নটি তাদের আলাদা করে দেয় তা হলো: তাদের কাছে কি এমন কিছু ছিল **যা যাচাই করা যায় ও মিথ্যা প্রমাণ করা যায়**? উপকথা সময়সীমা বেঁধে দেওয়া কোনো ভবিষ্যদ্বাণী দেয় না, নিজের যুগের জ্ঞানের বিরুদ্ধে যাওয়া কোনো মহাজাগতিক বর্ণনা দেয় না, আর চৌদ্দ শতাব্দী ধরে টিকে থাকা কোনো খোলা চ্যালেঞ্জও দেয় না।

### বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আপনি এখানে যা পড়লেন তা পাঁচটি সম্পূর্ণ স্বাধীন সূত্র, একটি আরেকটির উপর নির্ভর করে না: **একটি মহাজাগতিক বর্ণনা**, যা নিজ যুগের জ্ঞানের বিরোধী ছিল আর শতাব্দী পরে বিজ্ঞান যাকে সত্য বলেছে; **প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য**, যা অস্বীকৃত হওয়ার পর মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে এসেছে; **সময়সীমা-নির্দিষ্ট সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী**, যা বলা মতোই ঘটেছে; **খোদ প্রতিপক্ষের কিতাবের ভেতরের বক্তব্য**, যা এখনো তাদেরই হাতে আছে; আর **একটি খোলা ভাষাগত চ্যালেঞ্জ**, যা আজও কেউ গ্রহণ করেনি। একটি সূত্র ভেঙে পড়লেও বাকি চারটি দাঁড়িয়েই থাকবে।

### কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এখানকার যুক্তি হলো **স্বাধীন প্রমাণের সঞ্চয়ের** যুক্তি, আর আদালতে ও বিজ্ঞানে দুই জায়গাতেই এটিই কাজে লাগানো হয়। একটি প্রমাণ সম্ভাবনা হতে পারে, দুটি প্রমাণ কাকতালীয় হতে পারে; কিন্তু পরস্পর সম্পর্কহীন নানা ক্ষেত্র থেকে আসা — জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, চিকিৎসা, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও ভাষা — কয়েক ডজন প্রমাণ যখন সবাই এক দিকেই ইঙ্গিত করে, তখন তা আর কাকতালীয়তা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। আর কুরআন আপনার কাছে অন্ধ আনুগত্য চায় না; সাতশোরও বেশি জায়গায় সে আপনাকে দেখতে ও ভাবতে ডাকে: "তারা কি দেখে না?", "তারা কি চিন্তা করে না?", "তারা কি বোঝে না?", "বলুন, তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো।" আর যা সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা আপনার সামনে রেখেই দিয়েছে: **"আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাব দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে।"** আর আপনি দেখেছেন। বাকিটা কেবল আপনার উপরেই ছাড়া।